Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iv, October 2024, TIRJ/October 24/article - 37
Website: https://tirj.org.in, Page No. 323 - 330
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iv, published on October 2024, Page No. 323 - 330
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: info@tirj.org.in
(SJIF) Impact Factor 6.527, e ISSN : 2583 - 0848

মেদিনীপুরের ভূত-প্রেত কেন্দ্রিক লোককথা

সনজিৎ কুমার দাস
গবেষক, লোকসংস্কৃতি বিভাগ
কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়
Email ID: sanajitbeng111@gmail.com

Received Date *21. 09. 2024*
Selection Date *17. 10. 2024*

Keyword
Folktale, Village ghosts, Brahmadaitya, Ku-Purasha and Su-Purasha, Mamdo ghost, Shakchunni, Petni, Cow ghost, Chirkin ghost, Satabhin, Jakkha.

Abstract
The two words ghost and fear are closely related. Despite the changes in today's advanced educated civilized society, the scary, spooky atmosphere still exists in rural life. Human mind is fanciful and ghosts are manifestation of fear within subconscious human mind. Just as people have taken science to greater heights by harnessing their imaginative mind and manifesting his inventive powers. Similarly, a class of people ignored science and created various types of ghosts with their imaginary minds. One such environment resides in village societies of the undivided Medinipur districts. Even today, ghosts can be seen inside the minds of some villagers. So even today one can hear different kinds of ghost stories from rural people. The belief in ghosts as well as eerie places in the minds of the rural people can be seen. They think that ghosts live in dark bushes, forests, big trees etc. The people of this area believe that if a person dies with his unsatisfied mind, then that unsatisfied disembodied spirit does not disappear and wanders around his house and area. We know that there is no end to human needs so human mind is never satisfied. Besides, many suffer from diseases or die from injuries at a very young age. In that case also, from the unsatisfied soul, an incorporeal soul or ghost is born. This metaphysical spirit harms people when given time. Its proof can be heard from the mouth of the people of those areas. Again, people have given different names to ghosts according to their behavior and activities. Such as Brahmadaitya, Kupursha and Supursha, Mamdobhuta, Shakchunni, Petni, Hanuman Bhuta, Gomua Bhuta, Chirkin Bhuta, Satbahin etc. Therefore, various folk tales of these ghosts are heard in various rural areas of undivided Medinipur. There is a concept among people of this area about the incorporeal soul; after the death of a person, for the satisfaction of his soul, one has to go to Gaya and perform rituals like Pinddan and Shradhanam. Otherwise, this spirit harms people. And those who do not have the ability to go to Gaya and perform Shraddha, spend their whole lives in fear of ghosts. The fear of these ghosts has become so ingrained in the rural people that even if they are reasoned with, many times they do not want to understand. They cling to that belief and reformation and give it a day.

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iv, October 2024, TIRJ/October 24/article - 37
Website: https://tirj.org.in, Page No. 323 - 330
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Discussion

লোকসাহিত্য হল সংহত সমাজের সামগ্রিক চেতনার অলিখিত মৌখিক রূপ। আর এই লোকসাহিত্যের যে বিভাগগুলি রয়েছে তার মধ্যে লোককথা বা Folk-Tale অন্যতম। মানুষের গল্প শোনার আগ্রহ থেকে লোককথার উদ্ভব। লোককথা হল সংহত সমাজের মানুষের মুখে মুখে প্রবাহিত হয়ে আসা আখ্যানমূলক কাহিনি— যার মধ্যে লৌকিক ও অলৌকিক ঘটনা পাশাপাশি বিদ্যমান। সমূহ অলৌকিক ঘটনা থেকে মানুষের মনে সৃষ্টি হয়েছে ভয়। একসময় গ্রামীণ সমাজে মানুষের মনে ভয় গভীর আকারে দানা বেঁধে ছিল— সেই ভয় থেকে সৃষ্টি হয়েছে ভূত-প্রেত কেন্দ্রিক লোককথা। সংহত সমাজ ছাড়িয়ে বৃহত্তর সমাজে বা অভিজাত সমাজে এই লোককথার প্রসারণ ঘটেছে। ফলত এই লোককথারগুলি থেকে বর্তমান সমাজ ভয়-মূলক রস আস্বাদন করে চলেছে। শুধু তাই নয় সংহত সমাজের লোককথাগুলির প্রভাব ফেলছে এ সময়কার থ্রিলারধর্মী সাহিত্যগুলিতে। অর্থাৎ সংহত সমাজে সৃষ্টি হওয়া লোককথাগুলি বর্তমান সাহিত্য সমাজে বিশেষভাবে প্রাধান্য পাচ্ছে। বিশ্বায়নের এ যুগে লোককথাগুলি হয়ে উঠছে যুগ সম্পদ। কিন্তু লোককথাগুলির আবেদন সংহত সমাজ ও অভিজাত সমাজে একদম স্বতন্ত্র। সংহত সমাজে যা ছিল ভয়ের উপাদান অভিজাত সমাজে তাই পরিণত হয়েছে ভয় থেকে জাত আনন্দ উৎসারণের পরিপ্রেক্ষিত হিসেবে।

একবিংশ শতাব্দীতে শিক্ষার প্রসারের ফলে আদিম ভয় যেন মানুষের মন থেকে ক্রমশ কমে যাচ্ছে। শিক্ষার প্রসারের আলো মানুষের মনে যত গভীর ভাবে পতিত হয়েছে— তত ভূত-প্রেতে বিশ্বাসের অন্ধকার ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হয়েছে। কিন্তু এমন একটা সময় ছিল যখন যে কোনো গ্রামের আশেপাশের বনজঙ্গলে, গাছপালায়, ঝোপঝাড়ে, বাঁশের বাগানে, তালগাছে, পুকুরে, শ্মশানে, পরিত্যক্ত বাড়িতে কোনো না কোনো ভূতের আবাস ছিল বলে মানুষ মনে করত। সেই সময় শিশু ও অল্পবয়সী ছেলেমেয়েরা কোন সময় ঐ সব ভূতুড়ে জায়গায় যেত না। এমনকি সন্ধ্যার সময় বয়স্করাও ভূতুড়ে জায়গায় যেত না। তাই সেই সব ভূতুড়ে জায়গাকে কেন্দ্র করে একসময় নানান প্রেতাত্মা ও ভূত সম্পর্কিত লোককথার সৃষ্টি হয়েছিল। অবিভক্ত মেদিনীপুর (পূর্ব মেদিনীপুর, পশ্চিম মেদিনীপুর ও ঝাড়গ্রাম) জেলায় এই রকম অনেক লোককথা শুনতে পাওয়া যায়। এই লোককথাগুলিতে দেখা গেছে মানুষের মৃত্যু থেকে ভূত-প্রেত ভাবনার সৃষ্টি হয়েছে। যে মানুষ বেঁচে থাকা অবস্থায় অতৃপ্ত বাসনা রেখে অপঘাতে মৃত্যুবরণ করেছে সেই মানুষ সাধারণত মৃত্যুর পরে ভূত হয়ে তার অতৃপ্ত বাসনা পূর্ণ করার চেষ্টা করেছে। অবিভক্ত মেদিনীপুরের হিন্দু সমাজে একসময় ব্রাহ্মণরা আধিপত্য বিস্তার করেছিল। তাই তাদের দ্বারা দীর্ঘদিন সমাজ পরিচালিত হয়েছে। কিন্তু কালের অবসানে তাদের ক্ষমতা ধীরে ধীরে লোপ পেয়েছে। সেই সময় ব্রাহ্মণরা অনেক অতৃপ্ত বাসনা নিয়ে মৃত্যু বরণ করেছে। মৃত্যুর পর তাদের অতৃপ্ত বাসনা তারা পরিতৃপ্ত করেছে 'ব্রহ্মদৈত্য' ও 'কু-পুরষা ও সু-পুরষা' ভূত হয়ে। ঠিক একই ভাবে অবিভক্ত মেদিনীপুরের মুসলিম সমাজে একসময় মৌলবীদের দ্বারা সমাজ পরিচালিত হয়েছে। ধীরে ধীরে তাদের ক্ষমতাও লোপ পেয়ে সরকারের হাতে ক্ষমতা এসেছে। এছাড়া দেখা গেছে মুসলিম নারীদের তুলনায় পুরুষরা সবসময় বেশী ক্ষমতা ভোগ করে এসেছে। তাই দেখা গেছে এক সময় মুসলমান পুরুষও তাদের অতৃপ্ত বাসনা নিয়ে মারা যাওয়ার পর 'মামদো ভূতে' পরিণত হয়ে সমাজের মানুষকে শাস্তি দেতে চেয়েছে। অপরদিকে সমাজে চিরদিন নারীরা বঞ্চিত ও লাঞ্ছিত হয়ে আসছে। নারীরা তাদের বাসনাকে সমাজে পরিতৃপ্তি করতে পারছে না। তাই অবিবাহিত নারী যখন তার অতৃপ্ত বাসনা নিয়ে মারা যায় তখন সে 'পেত্নী' হয়ে তার অতৃপ্ত বাসনা পূর্ণ করার চেষ্টা করে। আবার বিবাহিত নারী যখন অতৃপ্ত বাসনা নিয়ে মারা 'শাকচুন্নি' ভূত হয়। এছাড়া অবিভক্ত মেদিনীপুরের বিভিন্ন গ্রামীণ এলাকায় প্রচলিত রয়েছে— 'গোমুয়া ভূত', 'পেঁয়াজ ভূত' 'চিড়কিন ভূত' 'যক্ষা' নিয়ে লোককথা।

ব্রহ্মদৈত্য : মেদিনীপুরে বসবাসকারী হিন্দুদের কাছে সবচেয়ে পরিচিত ভূত হল 'ব্রহ্মদৈত্য'। কোনো ব্রাহ্মণ অপঘাতে মারা গেলে সাধারণত 'ব্রহ্মদৈত্য' হয় বলে এই এলাকার মানুষেরা মনে করে। এই ভূত থাকে এক গ্রাম থেকে অন্য গ্রামে যাওয়ার পথের পাশে নেড়া বেলগাছ, পুরনো বট ও অশ্বত্থ গাছে। এছাড়া পুরনো ভগ্ন পরিত্যক্ত বাড়ির ভগ্ন পাঁচিলের ধারে বেলগাছে। গাছের কাছ দিয়ে রাতের অন্ধকারে যাওয়ার সময় এই ভূতকে অনেক সময় দেখা যায়, আবার অনেক সময় কথা বলতে হাসতে শোনা যায়। এরা সাদা ধুতি ও পৈতা পরিহিত অবস্থায় সাধারণ মানুষের তিন থেকে চার গুণ লম্বা

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iv, October 2024, TIRJ/October 24/article - 37
Website: https://tirj.org.in, Page No. 323 - 330
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

আকৃতির রূপ ধারণ করে যাদের রাশির সঙ্গে তার রাশির মিল আছে তাকে দেখা দেয়। ব্রহ্মদৈত্য সাধারণত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকতে ভালো বাসে। তাই ব্রাহ্মণের পূজারীর বেশে তাকে দেখা যায়। নোংরা অপরিষ্কার মানুষকে ব্রহ্মদৈত্য প্রচ্ছন্দ করে না, তাই নোংরা অপরিষ্কার মানুষকে ঘাড় মটকে শাস্তি দিতে চায়। ভূত সাধারণত মানুষের ক্ষতি করে থাকে কিন্তু ব্রহ্মদৈত্যর ক্ষেত্রে দেখা যায় অনেককে সাহায্য করতে। ব্রহ্মদৈত্য কোন মানুষের উপর সন্তুষ্ট হলে সেই মানুষকে সহায়তা করে। এই এলাকার মানুষের মতে ব্রহ্মদৈত্যের নজর যার দিকে থাকে তার ভাগ্য ফিরে যায়। আবার কোন মানুষের ব্যবহারে অসন্তুষ্ট হলে তার ক্ষতি করে থাকে। তাকে বিভিন্ন জায়গায় ঘুরিয়ে পরিশ্রম করিয়ে মৃত্যু পর্যন্ত ঘটিয়ে থাকে।

কু-পুরষা ও সু-পুরষা : মেদিনীপুরের বিভিন্ন গ্রামীণ এলাকার প্রাচীন বট, অশ্বত্থ, খেজুর, নারকেল, তাল প্রভৃতি গাছে থাকে ‘কু-পুরষা ও সু-পুরষা’। এছাড়া এলাকার বড় বড় পুকুরের পাড়ে এবং বিস্তীর্ণ ফাঁকা জায়গায় এদের দেখা যায়। ‘কু-পুরষা’ ও ‘সু-পুরষা’ নামে বোঝা যাচ্ছে এই ভূত দুটির আচার-আচরণ ভিন্ন রকমের। ‘কু-পুরষা’ ভূত সাধারণত মানুষের ক্ষতি সাধন করে তাকে মেরে ফেলতে চায়। আর ‘সু-পুরষা’ মানুষকে ‘কু-পুরষার’ হাত থেকে রক্ষা করে। এর ফলে দেখা যায় ‘কু-পুরষা’ ও ‘সু-পুরষার ‘মারামারি হয়। উভয় ভূতের পরণে সাদা ধূতি ও পাঞ্জাবি থাকে। আবার অনেক সময় গায়ে উত্তরীয় থাকে। অনেকের মতে ব্রাহ্মণ পরিবারের কেউ মারা যাওয়ার পর তার আত্মার শান্তি না মিললে তারা মূলত ‘কু-পুরষা’ ও ‘সু-পুরষায়’ পরিণত হয়।

শোনা যায় যাদের রাশির সঙ্গে ভূতেদের রাশি মিলে যায় তাকে সেই ভূত ধরে। যদি কু-পুরষার সঙ্গে কারোর রাশির মিল ঘটে তবে ‘কু-পুরষা’ তাকে ধরবে ও তাকে প্রচুর পরিশ্রম করিয়ে মেরে ফেলার চেষ্টা করবে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় পটাশপুর থানার পরশুরামপুর গ্রামের গৌরহরি দাসকে একসময় কু-পুরষা ধরেছিল। যার ফলে মাঝ রাত্রে সকাল হয়ে এসেছে ভেবে তার দাদারূপী কুপুরষার সঙ্গে সেঁই নিয়ে চাষের জমিতে জল দিতে যায়। দীর্ঘক্ষণ ধরে চাষের জমিতে জল দেওয়ার ফলে চাষের জমি পুরো জলে পরিপূর্ণ হয়ে যায়। তবুও ‘কু-পুরষার’ সঙ্গে একইভাবে সেঁইতে জল দিতে হয়। এর ফলে সে ক্লান্ত হয়ে পড়ে। যখন বুঝতে পারে যার ডাকে সাড়া দিয়ে এসে দীর্ঘক্ষণ জল দিচ্ছে সে তার দাদা নয় সে আসলে ‘কু-পুরষা’ ভূত। তখন কৌশল অবলম্বন করে দৌড়ে বাড়িতে এসে অজ্ঞান হয়ে পড়ে। বাড়ির লোক সবকিছু জানতে পারে এবং পরের দিন চাষের জমিতে গিয়ে দেখে জমিতে জল ভর্তি হয়ে গেছে। অপরদিকে ‘সু-পুরষা’ যাদের ধরে তারা যদি ব্রাহ্মণ হয় তখন তাদের গায়োত্রী মন্ত্র পাঠ করতে বলে। আর গায়ত্রী মন্ত্র পাঠ করতে পারলে ‘সু-পুরষা’ তাদেরকে ছেড়ে দেয়। এছাড়া ‘সু-পুরষার’ দ্বারা সে সময় অনেকে প্রচুর ধনসম্পত্তির মালিকও হয়েছিল তার প্রমাণ আমরা পাই। যেমন— পটাশপুর থানার জামবাড় গ্রামের ভুবন মাইতি ‘সু-পুরষার’ প্রভাবে অনেক ধনসম্পত্তির মালিক হয়েছিল। সেই ধনসম্পত্তির দ্বারা তার বংশধরেরা সুখে স্বাচ্ছন্দে জীবন অতিবাহিত করছে।

মামদো ভূত : হিন্দু ব্রাহ্মণরা অপঘাতে মারা গেলে যেমন ‘ব্রহ্মদৈত্য’ হয়, তেমনি কোন মুসলমান যখন অপঘাতে মারা যায় তখন তার অতৃপ্ত আত্মা ‘মামদো’ ভূত হয়। ‘মামদো’ ভূত বেশ ক্ষমতাবান মানুষের চেহারা ধারণ করে। এদের শরীরের গঠন খুব অদ্ভুত হয়। শরীরের উপর থেকে কোমর পর্যন্ত যে ভাবে থাকে তার তুলনায় কোমরের নীচের অংশ ক্রমশ সরু হয়। আর এদের পা এতটাই সরু হয় যে এরা সহজে বাতাসে ভেসে বেড়ায়। এদের লম্বা লম্বা দাড়ি থাকে, মাথায় মুসলিমদের টুপি, পরনে লুঙ্গি দেখা যায়। এরা সাধারণত কবরস্থান ও কবরস্থান সংলগ্ন তেঁতুল, শেওড়া, তাল গাছে থাকে। মামদো ভূতের আশ্রয় স্থলের কাছদিয়ে যখন কেউ যায় তখন এরা তাদের ঘাড়ে চাপে। ফলে ঐ ব্যক্তি তখন অস্বাভাবিক আচরণ করে। ‘মামদো’ ভূত ঘাড়ে চাপলে বলা হয় জিন ভর করেছে।

শাকচুন্নি : কোনো নারী দাম্পত্য জীবন পুরোপুরি ভোগ করবার আগে যদি অতৃপ্ত অবস্থায় মারা যায় তখন সে তার স্বামীর আশেপাশে ঘুরে বেড়ায় ‘শাকচুন্নি’ ভূত হয়ে। তার স্বামী যদি আবার বিবাহ করে তবে সেই অতৃপ্ত আত্মা তাদের নতুন দাম্পত্য জীবনে শত্রুতা করে। ফলে অনেক সময় দেখা যায় তার পরবর্তী পত্নীও দাম্পত্য সুখ ভোগ না করে মারা যায়। তখন পুরুষের এই বিবাহ দোষ কাটানোর জন্য শ্যাওড়া গাছের সঙ্গে প্রথমে বিবাহ পর্ব সম্পন্ন করে সব দোষ শ্যাওড়া

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iv, October 2024, TIRJ/October 24/article - 37
Website: https://tirj.org.in, Page No. 323 - 330
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

গাছের উপর চাপিয়ে নতুন বিবাহ দেওয়া হয়।[১] এই 'শাকচুন্নি' সাধারণত পুরনো তেঁতুল গাছ ও শেওড়া গাছে বসবাস করে। আর তাদের হাতে শাঁখা-পলা, সিঁথিতে সিঁদূর পরে রাতের অন্ধকারে অনেক সময় ঘুরে বেড়াতে দেখা যায়। এছাড়া যে মহিলার রাশির সঙ্গে ভূতের রাশির মিল রয়েছে মূলত সেই মহিলাকে ভর করে 'শাকচুন্নি'। 'শাকচুন্নি' বিবাহিত জীবনের সমস্ত সুখ ভোগ করতে থাকে ঐ মহিলার শরীরে থেকে। সংসারের সমস্ত কাজ খুব অনায়াসে করে ফেলে ও স্বামীর সঙ্গে বেশি সময় অতিবাহিত করতে চায়। তাই স্বামী ছাড়া অন্যের উপস্থিতি এরা বেশি পছন্দ করে না। অন্যের উপস্থিতির কারণে এরা অনেক সময় অস্বাভাবিক আচরণ করে।

পেত্নী : যে সমস্ত মেয়েরা অবিবাহিত অবস্থায় মারা যায়, তারা তাদের অতৃপ্ত বাসনা পূরণ করতে আমাদের চারপাশে 'পেত্নি' হয়ে ঘুরে বেড়ায়। এরা জীবিতকালে কোনো কাজ প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হওয়ার পর সেই আজ করতে অসফল হলে, মৃত্যুর পর তার আত্মা পৃথিবীতে বিচরণ করে সেই কাজ করার জন্য। তাই দেখা যায় পেত্নীরা খারাপ উদ্দেশ্য নিয়ে পৃথিবীতে বিচরণ করে। 'পেত্নী' কাউকে আক্রমণ করার আগে পর্যন্ত মানুষের ছদ্মবেশে ঘুরে বেড়ায়। কোন নিঃসঙ্গ পথিককে পেলে ভুলিয়ে ভালিয়ে নির্জন জায়গায় নিয়ে গিয়ে তার ঘাড় মটকে মেরে ফেলে। এদের ছদ্মবেশ এত নিখুঁত হয় দূর থেকে এদের চেনবার কোন উপায় থাকে না। তবে এদের চেনবার উপায় হল— এদের দেহের কোন ছায়া পড়ে না ও এদের পায়ের পাতা স্বাভাবিকভাবে সামনের দিকে না থেকে পেছনের দিয়ে ঘোরানো থাকে, তাছাড়া এরা নাকিসুরে কথা বলে। কোন কাজ করার জন্য এরা যে রাশির সঙ্গে তার রাশির মিল আছে তাকে দিয়ে ঐ প্রতিজ্ঞাবব্ধ কাজ করাবার চেষ্টা করে, সেজন্য 'পেত্নী' খুব বদমেজাজী হয়।

চিড়কিন ভূত : যে সমস্ত মেয়ে কুমারী অবস্থায় গর্ভবতী হয়ে যাওয়ার ফলে সামাজিক চক্ষু লজ্জার হাত থেকে মুক্তি পেতে বিষ খেয়ে, গলায় দড়ি দিয়ে, আগুনে পুড়ে মৃত্যু বরণ করে তারা সাধারণত 'চিড়কিন' ভূত হয়। মৃত্যুর আগে যেহেতু মেয়েটি বিবাহিত সুখ থেকে বঞ্চিত হয় তাই অপূর্ণ বাসনা নিয়ে সে ভূত হয়ে ছোঁক ছোঁক করে। বিশেষত সুন্দর ছেলে দেখলে তাকে আক্রমণ করতে চায়। তবে এই 'চিড়কিন' ভূতকে বশ করতে পারলে ভূত বউ হয়ে ঘরসংসার সামলে দেয়। এই 'চিড়কিন ভূত' নদীধারে, খালপাড়ে, নদী মোহানায়, বনধারে যেখানে মড়া পোড়ানো হয় ও গরু মোষের ভাগাড় আছে সেখানে রাতের অন্ধকারে হঠাৎ চিড়িক করে আলোর ফুলকানি রূপে দেখা যায়। চিড়িক চিড়িক করে আলো দেয় বলে এই ভূতের নাম চিড়কিন ভূত।[২]

সাতবহিনী : পশ্চিম মেদিনীপুর ও ঝাড়গ্রাম জেলার অ-আর্য সাঁওতাল সমাজে প্রচলিত এই সাতবহিনী ভূত। সাতবহিনী হল সাত বোন। কোন এক সময় সাত বোন আকস্মিক অপঘাতে মৃত্যু বরণ করেছিল আর তার ফলে তারা প্রেতযোনি লাভ করেছিল। তারপর থেকে তাদের আত্মা অশরীরী আত্মা হয়ে ঘুরে বেড়ায়। এই সাতবহিনী ভূত সাধারণত কোন মানুষ যদি পরপর সাত দিন জঙ্গলের একটি নির্দিষ্ট গাছের তলায় বাঁশি বাজায় তখন দেখা দেয়। এই সাত বোন তাকে বিভ্রান্ত করে তোলে, বহুক্ষেত্রে তারা সরল মানুষকে প্রলুব্ধ করে পাগল করে তোলে। সাঁওতালদের বিশ্বাস এরা বাতাসের আবরণে নিজেদের ঢেকে রেখে মানুষের ক্ষতি সাধন করে।[৩]

হনুমান ভূত : মেদিনীপুরের বিভিন্ন গ্রামে বিভিন্ন রকমের ফলের গাছ দেখা যায়। এই ফল যেমন মানুষের প্রিয় খাদ্য তেমনি হনুমানের ও প্রিয় খাদ্য। তাই ফল খাওয়ার লোভে প্রচুর হনুমানের উপদ্রব এই এলাকায় এখনও দেখা যায়। হনুমান যেমন এগাছ থেকে ও গাছে লাফিয়ে বেড়ায় তেমনি দেখা যায় ঐ এলাকায় কিছু অশরীরী আত্মা ভূতে পরিণত হয়ে হনুমানের মত আচরণ করে। তাই এই ভূতেদের হনুমান ভূত বলে। আগেকার দিনে মেদিনীপুরের বিভিন্ন গ্রাম্য এলাকায় হনুমান ভূতের খুব উপদ্রব ছিল। কথিত আছে কোনো মানুষ যদি তার অতৃপ্ত আত্মা নিয়ে মারা যায়, তাহলে সেই আত্মা অশরীরী আত্মা তথা ভূতে পরিণত হয়ে এলাকায় ঘোরাফেরা করে। তার এই উপদ্রব এলাকার মানুষকে অতিষ্ঠ করে তোলে। এখনও এই এলাকার বিভিন্ন গ্রামে গেলে হনুমান ভূত সম্পর্কে অনেক প্রচলিত কাহিনি শোনা যায়। এলাকার কেউ মারা গেলে

হিন্দু শাস্ত্রের রীতি নীতি অনুযায়ী তার আত্মার শান্তি কামনার্থে গয়ায় গিয়ে পিণ্ডদান ও শ্রাদ্ধানুষ্ঠান করতে হয়। যদি তা না করা হয় তাহলে সেই অশরীরী আত্মা ভূত হয়ে এলাকায় ঘোরাফেরা করে। এই ভূতেরা বড় বড় গাছে, ঝোপঝাড়ে আশ্রয় গ্রহণ করে। তাই এলাকার বড় বড় গাছ, ঝোপঝাড় রাতের বেলায় মানুষের ভয়ের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। আর ভূতেরা এইসব জায়গা বেছে নিয়ে মানুষকে ভয় দেখাতে থাকে।

হনুমান ভূত সম্পর্কে এলাকায় প্রচলিত জনশ্রুতি হল— হনুমান ভূত তেঁতুল গাছ, শেওড়া গাছ, বাঁশ গাছ, বট গাছ প্রভৃতিতে থাকে। ঐ সমস্ত গাছের নীচ দিয়ে রাতে মানুষ গেলে তাদের গায়ে হনুমান ভূত প্রস্রাব করে দেয়। ফলে মানুষ সেখান থেকে ভয়ে দৌড়ে পালায়। আরও শোনা যায়, হনুমান ভূত বাঁশ গাছে থাকলে অনেক সময় বাঁশ গাছ রাস্তার উপর ধাপিয়ে রেখে মানুষের চলাচলে বিঘ্ন ঘটায়। কেউ যদি ঐ বাঁশ গাছ ডিঙিয়ে যেতে চায় তখন ঐ বাঁশগাছটি হঠাৎ করে উপরে উঠে যায়। ফলে ঐ ব্যক্তি মাটিতে সজোরে আছড়ে পড়ে ভয়ে জ্ঞান হারায়। আবার অনেক ক্ষেত্রে মানুষ মারা যায়। তাই লোকমুখে শোনা যায়, হনুমান ভূত যখন বাঁশগাছকে রাস্তার উপর ধাপিয়ে রাখে তখন ঐ গাছ পা দিয়ে বা কোনো কিছু দিয়ে আঘাত করলে বা নিজে প্রস্রাব করে বাঁশগাছে ছড়িয়ে দিলে বাঁশগাছ উপরে উঠে যায়। হনুমানের কিচির মিচির আওয়াজ শোনা যায়। মানুষের আর কোন ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে না। মানুষ তখন সহজেই রাস্তা পারাপার করতে পারে। তবে এখন গ্রামীণ এলাকা বৈদ্যুতিক আলোয় আলোকিত হওয়ায় এবং অনেক ঝোপঝাড় পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হওয়ার ফলে হনুমান ভূতের উপদ্রব অনেকটা কমে গেছে।

পেঁয়াজ ভূত : আজ থেকে প্রায় ১৪-১৫ বছর পূর্বে পূর্ব মেদিনীপুর জেলার পটাশপুরের গ্রামীণ সমাজে পেঁয়াজ ভূতের উপদ্রব প্রথম শোনা যায়। এই পেঁয়াজ ভূতের উপদ্রবে মানুষের স্বাভাবিক জনজীবন ব্যাহত হয়। পেঁয়াজ ভূত সম্পর্কে এলাকার জনশ্রুতি হল— পেঁয়াজ ভূত কোন এক বয়স্ক মহিলার ছদ্মবেশে বাড়ি বাড়ি যায়। বিশেষ করে যে বাড়িতে ছোট ছোট শিশু রয়েছে সেই বাড়িতে ছদ্মবেশি পেঁয়াজ ভূত যায়। বাড়িতে গিয়ে সে গৃহস্থের কাছে কিছু খাবার চায়। যেহেতু গ্রামীণ সমাজে মানুষেরা অতিথিদের নারায়ণ বলে মনে করে। তাই অতিথি সেবা নারায়ণ সেবা মনে করে প্রতিটি গৃহস্থ তার সামর্থ অনুযায়ী অতিথিকে খেতে দেয়। প্রতিটি বাড়িতে রান্নার উপকরণ হিসাবে পেঁয়াজ থাকে। তখন ঐ বয়স্ক মহিলা খাবারের সঙ্গে একটা পেঁয়াজ খেতে চায়। আর ঐ মহিলা যখন পেঁয়াজ খায় তখন তার মুখ দিয়ে কাঁচা রক্ত ঝরে পড়ে। দেখলে মনে হয় সে যেন কাঁচা মাংস চিবিয়ে খাচ্ছে। আর খেতে খেতে বলে যে পেঁয়াজ দিয়েছে সে মারা যাবে বা ঐ বাড়ির কোন একটি শিশুকে উল্লেখ করে বলে ঐ শিশুটির নাকে মুখে রক্ত উঠে মারা যাবে। এই মুখ দিয়ে রক্ত পড়ার দৃশ্য দেখে এবং এই কথা শোনার পর বাড়ির লোকেরা হতভম্ব হয়ে পড়ে। আরও তারা অবাক হয়ে যায় যখন এই কথা বলার পর মহিলা অদৃশ্য হয়ে যায়। এই ঘটনায় মানুষ কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে ভয়ে আতঙ্কগ্রস্ত হয়। এই বুঝি ঐ ব্যক্তি বা শিশুটি মারা যায় এই ভয়ে পরিবারের লোকেরা ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে। আবার পার্শ্ববর্তী লোকেরা এই বুঝি তাদের বাড়িতে পেঁয়াজ ভূত আসে এই ভয়ে ভীত হয়ে থাকে। পেঁয়াজ ভূতের ভয়ে পটাশপুর এলাকার মানুষ ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে বাড়ির চৌকাঠে লেবু, কাঁচালঙ্কা মালা করে ঝুলিয়ে রাখে কিংবা কেউ কেউ বাড়ির সামনের দেওয়ালে মাঙ্গলিক ঘটির চিহ্ন এঁকে ওঁ বলে লিখে রাখে। তাদের ধারণা এইসব মাঙ্গলিক চিহ্ন থাকলে পেঁয়াজ ভূত তাদের বাড়িতে আর আসতে পারবে না।

গোমুয়া ভূত : 'গো' শব্দের অর্থ হল গরু আর 'মুয়া' শব্দের অর্থ হল মুখ। অর্থাৎ গরুর মুখ ও আকৃতির ন্যায় যে ভূত তাকে বলা হয় গোমুয়া ভূত।[৪] সাধারণত যে সমস্ত ভূতের কাহিনি শোনা যায় সেগুলি মূলত মানুষের অতৃপ্ত আত্মা থেকে সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু গোমুয়া ভূত গরু-বাছুর অপঘাতে মারা গেলে তাদের অতৃপ্ত আত্মা থেকে সৃষ্টি হয়। এই ভূত গরু বাছুরের আকৃতি নিয়ে রাতের অন্ধকারে ঘুরে বেড়ায় ও মানুষের ক্ষতি সাধনের চেষ্টা করে।

হিন্দুরা গরুকে দেবতা জ্ঞানে শ্রদ্ধা করে বলে তারা বাড়িতে গরু পোষে। তাই এই এলাকায় দেখা যায় প্রায় প্রতিটি বাড়িতে কিছু না কিছু গরু আছে। গৃহস্থের বাড়ির গরু হঠাৎ অসুস্থ হয়ে বা বয়সজনিত কারণে রোগে ভোগে যদি গলায় দড়ি থাকা অবস্থায় মারা যায় তাহলে ঐ গরু গোমুয়া ভূত হয়। এছাড়াও অনেক সময় কোন গাভীর পেটের বাছুর

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iv, October 2024, TIRJ/October 24/article - 37
Website: https://tirj.org.in, Page No. 323 - 330
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

উপযুক্ত পুষ্টির অভাবে বিকলাঙ্গ হয়ে জন্মালে ঐ বাছুর বেশিদিন বাঁচে না। ফলে ঐ বাছুর মারা গিয়ে গোমুয়া ভুত হয়। আরও শোনা যায় গাভীন গরু মারা গেলে সেও গোমুয়া ভূত হয়ে যায়।

এই এলাকায় অনেকে গভীর রাতে রাস্তায় বাছুরের ডাক শুনতে পায়। তখন তারা ঐ বাছুরের ডাককে গোমুয়া ভূতের ডাক বলে মনে করে। কথিত আছে অন্ধকার পক্ষে গভীর রাত্রে কোন মানুষকে যদি একা রাস্তায় হাঁটতে দেখে গোমুয়া ভূত, তাহলে ঐ ভূত ছোট বাচ্চুর হয়ে মানুষের আগে আগে ছুটে মানুষকে ভুল পথে অর্থাৎ তাদের আস্তানায় নিয়ে এসে তাকে আক্রমণ করে মেরে ফেলার চেষ্টা করে। গোমুয়া ভূতের আস্তানা মূলত বিভিন্ন গো-স্থান বা ভাগাড়। আবার অনেকে কারুর ঘরের বাছুর ভেবে তাকে ধরার জন্য ঐ বাছুরের পেছন পেছন ছুটে চলে নিজেরই ক্ষতিসাধন করে। গোমুয়া ভূত সম্পর্কে এই এলাকার সবচেয়ে জনপ্রিয় কাহিনি হল— কোনো মানুষ যদি গোমুয়া ভূতের কাছাকাছি চলে আসে তখন ঐ ভূত ছুঁচার আকার ধারণ করে মানুষের দু'পার মধ্য দিয়ে যেতে চেষ্টা করে। আর ঐ ছুঁচা যদি মানুষের দুপার মধ্য দিয়ে চলে যায় তখন ঐ মানুষ মারা যায়।

যক্ষা : মেদিনীপুরের বিভিন্ন গ্রামীণ এলাকায় ভূত প্রেত ও নানা রকম অপদেবতার সঙ্গে সঙ্গে যক্ষার প্রভাব বেশ শোনা যায়। যক্ষা গ্রামীণ এলাকার বিভিন্ন লতা-গুল্ম, কচুরিপানা, ঝোপঝাড় ভর্তি পুকুরে থাকে। আর এই যক্ষার এক পুকুর থেকে অন্য পুকুরে যাতায়াত থাকে বিভিন্ন নালাপথে। যক্ষা তার যাতায়াত পথে ও পুকুরে থাকাকালীন মানুষের প্রচুর ক্ষতি করে। শোনা যায় বেশিরভাগ ক্ষেত্রে যক্ষার দৃষ্টি বাড়ির কোন ছোট ছেলে বা ছোট মেয়েদের উপরে পড়ে। তাই যে পুকুরে যক্ষা আছে বলে বাড়ির বড়োরা মনে করে সেই পুকুরে ছোট ছেলেদের তারা একা একা নামতে দেয় না। এছাড়া জানা যায় যক্ষা সাত ঘোড়া ধন অর্থাৎ সোনার কয়েন ভর্তি সাতটি সোনার কলসি নিয়ে ভর দুপুরে বা গোধূলি বেলায় বা মাঝ রাতে পুকুরের জল থেকে একটু উপরে চরতে থাকে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে বর্ষাকালে পুকুর যখন জলভর্তি থাকে সেই সময় যক্ষা বেশি দেখা যায়। জ্যোৎস্নারাতে যক্ষা যখন সেই সোনার কলসী চরায় তখন চাঁদের আলো ঐ কলসীতে পড়ে চক্ চক্ করে, গোটা পুকুর আলোময় হয়ে যায়। আর কেউ যদি সেই কলসীগুলিকে দেখতে পায়, তাহলে সঙ্গে সঙ্গে সেই কলসীগুলি জলে ঝুপ ঝুপ করে পড়ে যায়।

মেদিনীপুরের বহু মানুষ বর্ষাকালে মাঝ রাত্রে মাছ ধরতে গিয়ে এই রকম অনেক চলন্ত সোনার কলসী দেখেছে এবং এক এক করে সেই কলসীগুলি জলে পড়ে যাওয়াও দেখেছে। এছাড়া যে বাড়ির প্রতি যক্ষার দৃষ্টি পড়ে সেই বাড়ির ছোট শিশুর মাকে বা বাবাকে যক্ষা স্বপ্নে দেখা দেয় ও তার ছোট শিশুকে চায়। এই বলে প্রতিশ্রুতি দেয় যে, তারা যদি তার বাড়ির ছোট শিশুকে দেয় তাহলে কলসীভর্তি টাকা দিয়ে যক্ষা তাদেরকে বড়লোক করে দেবে। আর যদি ঘুমের ঘোরে তারা রাজি হয়ে যায় তাহলে দেখা যায় কিছুদিনের মধ্যে ওই শিশুটি মারা যায় এবং তার পরিবার কলসী ভর্তি সোনার টাকা পেয়ে বড়লোক হয়ে যায়। এছাড়া গ্রামের বয়স্ক মানুষের কাছ থেকে জানা যায়, যক্ষা যদি কোন শিশুর বা কোন ব্যক্তির পা ধরে মাঝ পুকুরে টেনে নিয়ে যায় তাহলে এঁটো ভাত ঐ শিশু বা ব্যক্তির উপর ছড়ালে যক্ষা তার পা ছেড়ে দেয় আর তখন ঐ শিশু বা ব্যক্তি প্রাণে বেঁচে যায়।

আরও শোনা যায়, যক্ষা যখন সোনার কলসী ভর্তি টাকা নিয়ে এক পুকুর থেকে অন্য পুকুরে কোন নালা বা বাড়ির পিছন দিয়ে যায়, তখন যদি কেউ ঐ কলসীর উপর এঁটো ভাত ফেলে বা কোনো এঁটো জল ছিটিয়ে দেয় তখন যতগুলি কলসীতে এঁটো জল লাগে ততগুলি কলসী ঐ জায়গায় বসে থেকে যায়। আর ঐ দিন রাত্রে ঐ ব্যক্তিকে স্বপ্নাদেশ হয় এবং যক্ষার ইচ্ছানুসারে বাড়ির ছোট ছেলে বা ছোট মেয়েকে যক্ষা নিয়ে নেয় অর্থাৎ বাড়ির ছোট শিশু মারা যায়। ঐ পরিবার তখন সোনার কলসী ভর্তি সোনার টাকা পেয়ে বড়লোক হয়ে যায়। কথিত আছে মেদিনীপুরে অনেকেই এইরকম যক্ষার ধন পেয়ে প্রভূত সম্পত্তির মালিক হয়েছে। আর এই সম্পত্তি তাদের বংশধরেরা বংশপরম্পরায় ভোগ করে চলেছে।

আবার দেখা যায়, মেদিনীপুরের অনেক মানুষকে অনেকে যক্ষা বলে থাকে। যক্ষা যেমন তার সোনার কলসীকে সব সময় আগলে ধরে থাকতে চায়। ছোট শিশুর বিনিময় ছাড়া তার সোনার কলসীকে কাউকে দিতে চায় না। তেমনিভাবে এই এলাকার অনেক মানুষকে লক্ষ্য করা যায় তারা প্রচুর সম্পত্তির মালিক হওয়া সত্ত্বেও কোন কিছু ভোগ না করে খুব দীন-হীন ভাবে জীবন যাপন করে। তখন ঐ কৃপন ব্যক্তিকে এলাকার মানুষ যক্ষার সঙ্গে তুলনা করে মজা করে।

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iv, October 2024, TIRJ/October 24/article - 37
Website: https://tirj.org.in, Page No. 323 - 330
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

ভূতের মুদা : অনেক সময় জ্যোতিষীরা কুষ্ঠিবিচার ও হস্তরেখা বিচার করে মানুষের অনেকটা অতীত বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সম্পর্কে বলে দেয়। তেমনি মুদা দেওয়া জ্যোতিষ শাস্ত্রের সমান্তরাল আর এক রকম ভবিতব্য গননা বলে এই এলাকার মানুষ মনে করে ও গননার ফলকে তারা বিশ্বাস করে। এই এলাকায় মুদা দেওয়ার চল এখনও রয়েছে তবে আগেকার দিনে গ্রামীণ সমাজে মুদা দেওয়ার প্রচলন খুব রমরমিয়ে চলত। সে সময় কারোর বাড়ী থেকে টাকা-পয়সা, গহনাগাটি, জিনিসপত্র হারিয়ে গেলে বা কেউ চুরি করে নিলে মানুষ মুদা দিয়ে সেইসব জিনিসের সন্ধান পেতে চেষ্টা করত। বেশীরভাগ ক্ষেত্রে তারা হারিয়ে যাওয়া জিনিস ফিরে পেত আবার কিছু ক্ষেত্রে ফিরে পেত না। এই এলাকায় একসময় যেহেতু খুব ভূতের উপদ্রব ছিল। তাই সেই সময় প্রায় দেখা যেত বিভিন্ন মানুষকে বিভিন্ন রকম ভূতে ধরেছে। এই ভূতে ধরাকে এই এলাকার মানুষ 'ভূতভেটা' বলে। এই ভূতভেটা মানুষকে যে ভূত ভেটত সে সেই ভূতের মত আচরণ করত। দেখা যেত ভূতে ভেটলে মানুষ স্বাভাবিক আচরণ না করে অস্বাভাবিক আচরণ করে এবং মানুষের ক্ষতি করতে চেষ্টা করে। আর তখন তার পরিবার পরিজন অতিষ্ট হয়ে উঠত এবং ভূত তাড়াতে চেষ্টা করত। বহু মানুষকে একসময় ভূত ভেটত বলে এই এলাকায় ভূতের মুদা দেওয়ারও প্রচলন ছিল। লোকমুখে শোনা যায়, ঐ ভূতে ভেটা ব্যক্তিকে সেই সময় যা জিজ্ঞেস করা হয় সে নাকি সবই তার সঠিক উত্তর দেয়। তাই ঐ মানুষটিকে কি ভূত, কিভাবে তার শরীরে এসেছে তা জানার জন্য ভূতের মুদা দেওয়া হত। পূর্ব মেদিনীপুরের পটাশপুর এলাকায় সে সময় ভূতের মুদা দিতেন গোকুলপুরের জ্যোতিবর ও বাঁকাকুড়ের শচিনন্দন গোস্বামী। তারা মুদা দিয়ে সঠিকভাবে ভূত নির্বাচন করত। ভূতেরা যে জায়গায় থাকে সে জায়গা দিয়ে অমাবস্যা বা ভর দুপুরে গেলে মানুষকে ভূত ভেটত। তাই এই এলাকার কাউকে ভূতে ভেটলে তারা এই দুজনের কাছে নিয়ে যেত মুদা দিয়ে ভূত তাড়ানোর জন্য। ভূত তার শরীর ছেড়ে চলে গেছে এটা জানান দিত কোন গাছের ডাল ভেঙ্গে দিয়ে। এছাড়াও শোনা যায় ভূত শরীর ছেড়ে না যেতে চাইলে যাকে ভূতে ভেটেছে তাকে ঝাড়ু, লাঠি, জুতো প্রভৃতি দিয়ে প্রচন্ড মারধর করত। মারধর খেয়ে ভূত শরীর ছেড়ে চলে যেতে চাইত। তখন যাকে ভূতে ভেটেছে সে দৌড়ে গিয়ে যেখান থেকে ভূত ভেটেছে সেখানে গিয়ে আছাড় খেয়ে পড়ে জ্ঞান হারাত। আর যখন তার জ্ঞান ফিরত দেখা যেত সে স্বাভাবিক আচরণ করত এবং ভূতে ভেটার কথা সে কিছুই মনে করতে পারত না। এলাকার মানুষের কাছ থেকে জানা যায় জ্যোতিবর মূলত শনি মঙ্গলবার সন্ধ্যাবেলায় ভূতের মুদা দিত। জ্যোতিবর অশিক্ষিত মানুষ হলেও মুদা দেওয়ার সময় বিভিন্ন ভাষায় কথা বলত। ভূতের মুদা দেওয়ার জন্য কখনও ছোটবাবু আবার কখনও বড়বাবুকে ডাকত। ছোটবাবু জ্যোতিবরের শরীরে প্রবেশ করলে দেখা গেছে জ্যোতিবর হিন্দীভাষায় কথা বলতে শুরু করে আর বড়বাবু হলে ওড়িয়া ভাষায় কথা বলে, ভূত ভেটেছে কিভাবে তা ভূতকে জিজ্ঞাসা করে তাকে তাড়াতে চেষ্টা করে। তবে জ্যোতিবর ও শচীনন্দন গোস্বামী মারা যাওয়ার পর বর্তমানে এই এলাকায় ভূতের মুদা দেওয়ার রীতি নেই বললে চলে।

বর্তমান সময়ের মানুষ বিজ্ঞান মনস্ক। তাই সব কিছুকে বিজ্ঞানসম্মত যুক্তি দিয়ে বিচার বিশ্লেষণ করতে চায় তারা। তবে কখনও কখনও পরিবেশ-পরিস্থিতি মানুষকে ওই সব যুক্তি তর্ক থেকে দূরে নিয়ে যায়— পরিস্থিতির কাছে মানুষ তখন খুব অসহায় বোধ করে। আর এই অসহায়তা সবচেয়ে বেশি গ্রাস করে গ্রাম্য সমাজ জীবনকে। যে জীবনে প্রতিনিয়ত ঘটে চলেছে আলো-আঁধারি খেলা। এই খেলার মাঝে পড়ে মানুষ অনেক সময় দিশাহারা হয়ে পড়ে। আর এই গ্রাম্য জীবনে মানুষকে দিশাহারা অসহায় করে তোলে ভূত-প্রেত প্রভৃতি অশরীরী আত্মা। তবে যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে আজকের উন্নতশীল শিক্ষিত সভ্য সমাজের নানা পরিবর্তন ঘটেছে, তবুও ভূতের অস্তিত্ব এখনো পর্যন্ত গ্রাম্য জীবনে কিছুটা রয়েছে। ভূতের হাত থেকে মুক্তি পেতে সে বর্তমানে নানা কৌশল আবিষ্কার করেছে। যেমন ভূত-প্রেত আলো ও আগুনকে ভয় পায় বলে সে রাতকে আলোকিত করার চেষ্টা করছে, ভূত লোহার কাছে আসে না বলে সে বাড়িতে লোহার ব্যবহার করছে। থুতু-প্রসাব-পায়খানা অশুচি হওয়ার জন্য এগুলি থেকে ভূত-প্রেত দূরে থাকে তাই ভূতের ভয় দেখা দিলে, সে প্রস্রাব করে তার চারদিকে ছড়িয়ে দেয়। এ জন্য বাড়ির আশেপাশের বনজঙ্গল, ঝোপঝাড়, বাঁশের বাগান, তালগাছ, শ্যাওড়া গাছ, বটগাছ, অশ্বস্থ গাছ, তেঁতুল গাছ, অপরিষ্কার পুকুর, শ্মশান, পরিত্যক্ত বাড়ি রাখতে চাইছে না। আবার বর্তমান এই এলাকার মানুষ, মারা যাওয়ার পর তার আত্মার সন্তুষ্টির জন্য গয়ায় গিয়ে পিণ্ডদান ও শ্রাদ্ধানুষ্ঠান করে। এইভাবে এই

এলাকার মানুষ ভূত-প্রেতের ভয় থেকে ক্রমশ মুক্তি পাচ্ছে। সেইজন্য ভূত-প্রেত কেন্দ্রিক লোককথা ক্রমশ সমাজ থেকে হারিয়ে যাচ্ছে।

Reference:

১. দাস, মন্মথনাথ, পটাশপুরের সেকাল একাল, দে পাবলিকেশন্স; ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা- ৭৩, এপ্রিল ২০১৩, পৃ. ১২৩

২. মাহাত, বঙ্কিমচন্দ্র, *ঝাড়খণ্ডের লোকভাবনা,* কথাশিল্প; ১৯ শ্যামচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা- ৭৩, বৈশাখ ১৩৯০, পৃ. ২১৫

৩. তদেব, পৃ. ২১৮

৪. তদেব, পৃ. ২১৮

তথ্যদাতা :

১. রামচন্দ্র দাস, ব্যবসায়ী, বয়স : ৬৪, পরশুরামপুর, পটাশপুর, পূর্ব মেদিনীপুর

২. জমাদার হাঁসদা, গবেষক, বয়স : ৩৩, বেলপাহাড়ী, ঝাড়গ্রাম

৩. আদিত্য মাইতি, কৃষিকাজ, বয়স : ৬২, পরশুরামপুর, পটাশপুর, পূর্ব মেদিনীপুর

৪. সুবল দাস অধিকারী, পৌরহিত্য, বয়স : ৬৩, টেপরপাড়া, পটাশপুর, পূর্ব মেদিনীপুর